ড. ইউনূসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও নাগরিক শক্তির মৃত্যু

প্রতিবছর পৃথিবীর নানা দেশ তাদের ভালো কাজগুলোর স্বীকৃতি হিসেবে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার অপেক্ষা করে। সেইসব ভালো ও কার্যকর আবিস্কার ও সামাজিক কাজগুলোকে এগিয়ে নিতে নানা পৃষ্ঠপোষকতাও করে। এটি এক অনন্য সম্মান। সেই সম্মান বাংলাদেশের ঘরে আসার পরেও হোঁচট খেয়েছিলো।

হ্যাঁ, কথা হচ্ছিলো ড. ইউনুসকে নিয়ে। নোবেল পেয়ে তিনি নিজেকে তার যোগ্য করে প্রকাশ করতে না পেরে পরিচিতি পেয়েছিলেন নেতিবাচক নানা তকমায়। ২০০৭ সাল সেটাকে ত্বরান্বিত করেছিলো। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে ২০০৭ সালের সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়কের সময়টা ছিলো কালো অধ্যায়। একদল মানুষ রাজনীতিতে সংস্কার আনার নামে দেশকে বিরাজনীতিকরণের দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছিলো প্রধান দুই দলকে নিস্ক্রিয় করার মাধ্যমে। সেই সময়টাকে স্বর্ণমুহুর্ত হিসেবে লুফে নেন ড. ইউনুস তার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে নিতে। ঘোষণা দেন – তার নেতৃত্বে নতুন এক রাজনৈতিক দল হবে, যার নাম হবে নাগরিক শক্তি।

বেশিদিন সময় নেননি তিনি। নোবেল পুরষ্কার লাভ করার মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই রাজনৈতিক দল গঠন করার কার্যক্রম শুরু করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন তিনি। সেসব দিন আমরা যারা ভুলে গেছি তারা আরেকবার স্মরণ করি এই মানুষটির শিখরে ওঠার আকাঙ্ক্ষাকে।

শোনা যায়, সেই আকাঙ্ক্ষার জায়গা এতোই প্রকট ছিলো যে ফখরুদ্দিন আহমদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করার আগে সেনাবাহিনীর তরফ থেকে অধ্যাপক ইউনূসকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। সেটিও তিনি ফিরিয়ে দেন। কোন সৎ উদ্দেশ্য থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এমন নয়। কেনো করেছিলেন এমন? হিসেব ছিলো পরিস্কার। স্বল্প মেয়াদী সরকার হওয়ায় কেয়ারটেকার প্রধান হওয়ার প্রস্তাবে রাজি হননি ড. ইউনূস। তার স্বপ্ন ছিল দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকা। আর এ জন্য ‘নাগরিক শক্তি’ নামে নতুন দল গঠনও করেছিলেন।

তারপর কী হলো? সেই দল কোথায় গেলো। তার উদ্দেশ্য যে সৎ ছিলো না তা নাগরিক শক্তির ঘোষণা ও সাগরিক শক্তি না করার ঘোষণা দুটো

থেকেই স্পষ্ট হয়। চলুন পিছনে ফিরে যাই। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ভারত সফরে যান। সে সফরে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেবার জোরালো সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। ৩১শে জানুয়ারি দিল্লীতে এক সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, দেশের পরিস্থিতি বাধ্য করলে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেবেন। দেশকে উদ্ধারের প্রকল্প নিয়ে হাজির হওয়া ইউনুস বলেছিলেন, রাজনীতিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করার মতো ব্যক্তি আমি নই। কিন্তু পরিস্থিতি যদি বাধ্য করে তাহলে রাজনীতিতে যোগ দিতে আমি দ্বিধা করবো না।

নাগরিক শক্তির মৃত্যু ঘটেছিলো ইউনুসের হাত ধরেই। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত দুই নেত্রীকে রাজনীতি থেকে বাইরে রাখা কিংবা বিদেশে পাঠিয়ে দেবার নানা চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। অধ্যাপক ইউনূস সে পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন মাত্র। তিনি ঘোষণা দিয়েও সামাল দিতে পারেননি। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে এসে মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা সম্ভব হবে না। সে পরিস্থিতিতে ডঃ ইউনুস নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠনের বিষয়ে একটু দ্বিধায় পড়ে যান।

অনেকের সঙ্গে দল নিয়ে আলাপ করলেও তিনি গ্রীনসিগন্যাল পাননি। ফলে ২০০৭ সালের ৩রা মে অধ্যাপক ইউনূস রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া থেকে সরে আসার ঘোষণা দেন। রাজনীতিতে আসার জন্য তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে যে খোলা চিঠি দিয়েছিলেন তার তিনমাসের মধ্যেই সে প্রক্রিয়া থেকে সরে আসেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
এবং তার সেই নাটকের জবনিকাপাত ঘটেছিলো আবারও একটি খোলা চিঠি দিয়েই। এজন্য তিনি জাতির উদ্দেশ্যে একটি চিঠি প্রকাশ করেন। তিনি জাতির উদ্দেশ্যে সে চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, “যাদেরকে সঙ্গে পেলে দল গঠন করে জনগণের সামনে সবল ও উজ্জ্বল বিকল্প রাখা সম্ভব হতো তাদের আমি পাচ্ছি না। আর যারা রাজনৈতিক দলে আছেন তারা দল ছেড়ে আসবেন না। বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এ পথে অগ্রসর না হওয়াই সঠিক হবে মনে করে এ প্রচেষ্টা থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

এই যে রাজনৈতিক দল করার আকাঙ্ক্ষা এবং যথেষ্ট সাড়া না পেয়ে পিছিয়ে পড়া সেখানো কোথাও ড. ইউনুস নিজেকে সমালোচনা করেননি। তার মতো একজন ব্যক্তির সেটাই করার কথা ছিলো। কেনো তিনি যথেষ্ট সাড়া পেলেন না সেখানেও তিনি কখনওই নিজের কমতি দেখতে পাননি। সবসময়েই তিনি অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলেছেন। কখনও দোষ জনগনের, যারা তার উদ্দেশ্য বুঝতে অক্ষম ছিলো, কখনও

দোষ মাঠের রাজনীতিবিদদের, যারা তার ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে রাজি হননি, কখনও দোষ সময়ের, যে সময়ে ‘ফাঁকা মাঠেও’ তিনি গোল দিতে পারেননি।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন বেশি বিএনপি-জামায়াত আমলেই

“বাবারা, আমার মেয়েটা ছোট, তোমরা একজন একজন করে এসো, নইলে ও মরে যাবে।” ১৩ শব্দের বাক্যে একজন মায়ের আকুতি কী আমরা ভুলে গেছি। সন্তানের উপর কোতোটা বরবর নির্যাতন হলে একজন মা এভাবে আকুতে জানাতে পারে? কিন্তু মায়ের চোখের জল আর গগন বিদারী আহাজারীতেও নরপিশাচদের এতোটুকু মন গলেনি।

পূর্ণিমা রাণী শীলের বাড়ি সিরাজগঞ্জের উল্লাপড়ায়। ২০০১ সালে পূর্ণিমার বয়স মাত্র তেরো বছর। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী সে। গ্রামের ৮-১০টি কিশোরীর মতো উচ্ছল চঞ্চল প্রাণে বেড়ে উঠছিল। কিন্তু ১৩ বছর বয়সে, ২০০১ সালের ৮ অক্টোবর তার জীবনে নেমে আসে কালো অন্ধকার। তছনছ করে দেয় তার তারুণ্যে ভরা জীবনকে। সেই রাতে পূর্ণিমার বাড়িতে হামলা চালায় বিএনপি-জামাতের নেতাকর্মীরা। এরপর পূর্ণিমা আর তার মা’কে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বাড়ির পাশের একটি ক্ষেতে। পনেরো থেকে বিশজন বিএনপি-জামায়াতের ক্যাডার ধর্ষণ করে কিশোরী পূর্ণিমাকে। মায়ের সামনেই মেয়ের ছোট্ট শরীরটার ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল নরপিশাচের দল। কান্না করতে করতে পশুগুলোর কাছে মিনতি করছিলেন মা। বলছিলেন, “বাবারা, আমার মেয়েটা ছোট তোমরা একজন একজন করে এসো, নইলে ও মরে যাবে।”

ছবি রানীর বাড়ি বাগেরহাটের রামপালে। ২০০২ সালের ২১ শে আগস্ট তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত জোট বাহিনীর নেতাকর্মীদের গণধর্ষণের শিকার হন তিনি। বাসস্ট্যন্ড থেকে ছবি রানীর কাপড় খুলে ফেলে বিএনপি-জামায়াতের ক্যাডারবাহিনী। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বিএনপি অফিসে। এরপর পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করা হয়। নরপিশাচরা শুধু ধর্ষণ

করেই ক্ষান্ত হয়নি, ছবি রানীর গোপন অঙ্গে মরিচের গুড়া, বালি আর কাচের গুড়া ঢুকিয়ে নির্যাতন করে।

২০০১ সালের ১৬ নভেম্বর ভোলা জেলার চরফ্যাসন উপজেলায় বিএনপি নেতাকর্মীরা ২০০ হিন্দু নারীকে গণধর্ষণ করে। সবচেয়ে ছোট ভিকটিমের বয়স ছিল 8 বছর আর সবচেয়ে বড়টির বয়স ছিল ৭০ বছর। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সারাদেশে এমন কয়েকশ’ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। চক্ষুলজ্জা আর প্রাণের ভয়ে অনেক তা প্রকাশ্যে আসেনি। তাদের সবার অপরাধ ছিল, তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং তারা বঙ্গবন্ধুর নৌকার সমর্থক।

২০০১ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকেই সনাতন ধর্মালম্বীদের উপর হামলা শুরু হয়, যা চলে পরবর্তী পাঁচ বছর। বাগেরহাট, বরিশাল, ভোলা, বগুড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, ফেনী, গাজীপুর, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, মুন্সিগঞ্জ, নাটোর, পিরোজপুর, সিরাজগঞ্জ, সাতক্ষীরা, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ জেলায় হিন্দুদের উপর পরিকল্পিত হামলা হয়। দ্বীপ জেলা ভোলায় প্রায় দুই মাস ধরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারের উপর নির্যাতন চলে। যোগাযোগব্যবস্থা খারাপ থাকায় প্রশাসনের লোকজন এমনকি সংবাদকর্মীরাও নির্যাতনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি। সেসময় সারাদেশে বাড়িঘর লুটপাট, বাড়ি থেকে উচ্ছেদের মতো অজস্র ঘটনা ঘটে। এসবের অধিকাংশই পুলিশের নথিভুক্ত হয়নি। ভুক্তভুগীরা ভয়ে কোন অভিযোগ পর্যন্ত করেননি।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব বলছে, ১৯৯৬, ২০০১ বা তার আগের প্রতিটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঠিক পরের বছরে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, ধর্ষণ ও ধর্ষণ চেষ্টা বেশি। শুধু ব্যতিক্রম চিত্র দেখা যায় ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর। ১৯৯৬ এর নির্বাচনের বছরে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২১৪টি, পরের বছরে ৫৫৪টি । ২০০১ সালে ধর্ষণের ঘটনা ৫৬৬টি হলেও পরের বছরে তা দাঁড়ায় ১ হাজার ৯১টিতে। ২০১৪ সালে নির্বাচনের বছরে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ৫৪৫টি, পরের বছরে এ সংখ্যা ছিল ৬৯০। ২০১৮ সালে নির্বাচনের বছরে ধর্ষণের ঘটনা ৫৫৬টি, পরের বছরে তা দাঁড়ায় ১ হাজার ৯৭টিতে।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর নির্যাতনের ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য ‘হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ’ নামে একটি সংগঠন হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন দায়ের করে। হাইকোর্ট এক আদেশে নির্যাতনের ঘটনা তদন্তে

একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের নির্দেশ দেন। এক বছরের বেশি সময় তদন্ত শেষে ২০১১ সালের ২৪ এপ্রিল সরকারকে ৫ খণ্ডের ১ হাজার ১০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন জমা দেয় কমিশন। প্রতিবেদনে দোষীদের চিহ্নিত করা এবং নির্যাতন প্রতিরোধে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশের নির্দেশনা চেয়ে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ হাইকোর্টে আরেকটি রিট দায়ের করলে আদালতের নির্দেশ মোতাবেক প্রতিবেদন ২০২২ সালের ১ এপ্রিল গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

তদন্ত কমিশনের ওই প্রতিবেদনে নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় ঢাকায় ২৭৬টি, চট্টগ্রামে ৪৯৭টি, সিলেটে ১৭টি, খুলনায় ৪৭৮টি, রাজশাহীতে ১৭০টি এবং বরিশালে সর্বাধিক ২ হাজার ২২৭টি ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৯২টি হত্যা, ১৮৪টি ধর্ষণ-সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনারও উল্লেখ আছে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বারবার ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কেন নিযাতনের শিকার হন? বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ভোটারের সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ। নির্বাচনের মাঠে এই ১০ ভাগ ভোটারই জয় পারাজয়ে অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করে। সংখ্যালঘু ভোটারদেরকে বলা হয়, আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক। যদিও গবেষণায় দেখা যায়, সংখ্যালঘু ভোটাররা সব সময় যে একটা দলের পক্ষে ভোট দিয়েছে বা আনুগত্য প্রকাশ করেছে বিষয়টি এমন নয়। বাংলাদেশের বিভক্ত রাজনীতিতে সংখ্যালঘু ভোটারদের ভোটও বিভক্ত হয়ে পরে এবং কোন দলের প্রতি তাদের সমর্থনও প্রত্যাহার করে। সুতরাং সংখ্যালঘু ভোটার মানেই আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক এই বাস্তবতা সত্য নয়। কিন্তু বিএনপি-জামায়াতের প্রথম হামলার শিকার হন ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে আওয়ামী নেতৃত্ব মুছে ফেলা এবং যুদ্ধপরাধীদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে পাকিস্থানের পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশ থেকে সনাতন ধর্বলম্বীদের সমূলে উৎখাতের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে জামায়াত-বিএনপি জোট। তাই প্রতিবার নির্বাচনে তারা হারলে বা জিতলেও সবচেয়ে বড় আক্রোশ মিটিয়েছে হিন্দুদের নির্যাতন, ধর্ষণ আর দেশ থেকে থেকে বিতাড়িত করে।

তবে এখন আর ভয় পাওয়ার সময় নেই। রুখে দিতে হবে নরপশুদের। আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজেদের দাঁড়াতে হবে। কারণ এই দেশটি সবার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আশ্বস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন,

‘নিজেদের সংখ্যালঘু মনে না করে, মনে করবেন আপনারা এই দেশেরই নাগরিক। সমান নাগরিক অধিকার আপনারা ভোগ কখনো নিজেদের মনে হীনম্মন্যতা নিয়ে আসবেন না।’

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

ওবামা, হিলারি এবং কেরি কেনেডিকে খোলা চিঠি…

প্রিয় আমেরিকান ত্রয়ী। আমি সেরকম কেউ নই। খুব সাধারণ মানুষ। ১৬০ তো বটেই আপনারা যদি ১০৬০ জন বিশিষ্ট মানুষের তালিকা করেন তার মধ্যে আমার নাম পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সম্প্রতি আপনাদের নোবেল জয়ী বন্ধু ড. ইউনূসের পক্ষ নিয়ে বাংলাদেশের সরকার প্রধানকে যে বিব্রতকর খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন তার প্রতিবাদ করেছেন আমার দেশের ১৭১ জন নাগরিক। এর মধ্যেও আমার নাম নেই। তবু আমি বিব্রত। আমি কেন, যেকোন মিথ্যাচারে বহু মানুষ বিব্রত হয়। আমি আসলে তাদের প্রতিনিধি।

কোন ভুমিকায় না গিয়ে একটি বিষয় আমি সরাসরি বলতে চাই। ইউনূস সাহেবের ব্যাপারে আপনার না জেনে, না তদন্ত করে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। আজ বলে নয়। অনেক দিন ধরেই দিচ্ছেন। যেটা আপনাদের সারা জীবনের ক্যারিয়ারের সঙ্গে সাংঘার্ষিক। ভুল বুঝবেন না দয়া করে। আমি সরকারের পক্ষ নিচ্ছি না। আমি প্রথমত বিব্রত আপনাদের জন্যে। কারণ আপনাদের জানি। আপনারা যার যার ক্ষেত্রে এভারেস্ট সমান উঁচু। নিজের দেশতো বটেই সারা পৃথিবীর মানুষের কথা আপনারা ভাবছেন। কাজ করছেন। শুধু বাংলাদেশের সামনে এসে কেন বিতর্কিত হবেন?

তবু যদি বলেন এটা আপনাদের ব্যক্তিগত আচরণ। তাহলে হয়তো এড়িয়ে যেতাম। কিন্তু মূল সমস্যাটা বর্তমান সময়ের। সামনে আমাদের জাতীয় নির্বাচন। এই সময়ে আপনাদের চিঠির মধ্যে লাভের আশা খুঁজছে একটি গোষ্ঠী। আর আপনাদের বন্ধু এক ঢিলে দুই পাখি মারছেন। নিজের অন্যায়ের পক্ষে জনমত গঠনও হচ্ছে, সরকারের ওপর ঝোপ বুঝে কোপ মারাও হচ্ছে। আর আপনারা এর ক্রীড়ানক হচ্ছেন। তার পরেও যদি এটাই

আপনাদের ইচ্ছে হয় আপনারা আপনাদের বন্ধুর পক্ষে বলুন। কিন্তু তদন্ত করে বলুন। আমি নিশ্চিত আপনাদের বন্ধু সব কথা বলেননি। আমি আপনাদের জন্যে সেরকম কিছু না বলা কথা এই চিঠিতে হাজির করছি।

আমাদের একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন ছিলো, নাম ২০০০। ওই পত্রিকায় ২০০৯ সালের মে মাসের একটি সংখ্যায় প্রকাশ হয়েছিল ‘সুফিয়ার কবর চাঁদার টাকায় / ইউনূসের হাতে নোবেল’খবরের বিষয়বস্তু, আজকের আলোচিত ইউনূস সাহেব ১৯৭৪ সালে তার ক্ষুদ্রঋণের কাজ শুরু করেছিলেন নিজের গ্রাম থেকে। প্রথম ঋণটি তিনি দিয়েছিলেন এই খবরের সুফিয়া বেগমকে। তিনি গ্রামের মানুষকে জানিয়েছিলেন ইউনূসের গ্রামীণব্যাংকের কথা। খুব অল্প দিনেই দারিদ্র্য পিড়ীত ওই গ্রামে নগদ টাকার মহোৎসব লেগেছিল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই সুফিয়াসহ বহু ঋণ গ্রহিতা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হন।

১৯৯৮ সালে এই সুফিয়া মারা যান প্রায় বিনা চিকিৎসায়। গ্রামের মানুষ চাঁদা তুলে তার দাফনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর এই ক্ষুদ্র ঋণ, দেশের বেশিরভাগ এলাকায় টেকসই হয়নি। যেসব সংগঠন দরিদ্র মানুষকে টাকা দিয়ে মনিটরিং করেছিলো, তাদের ক্ষেত্রে কিছু কাজ হয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ এলাকায় মানুষ হয়েছে ঋণ নির্ভর। এতে ক্ষুদ্র ঋণের বাজার বড় হয়েছে। কিন্তু মানুষের ভাগ্য ফেরেনি। ঋণের চাপে কত মানুষ আত্মহত্যা করেছে তা রীতিমত গবেষণার বিষয় । আপনারা চাইলে কাজটি করে দেখতে পারেন। গোপনে আপনাদের দূত পাঠাতে পারেন ইউনূস সাহেবের মডেল গ্রাম জোবরায়। আজও সেখানে ক্ষুদ্র ঋণের হাহাকার কাটেনি।

আসি যে মামলার সূত্র ধরে আপনারা ইউনুস সাহেবের জন্যে উদ্বিগ্ন, সেটা নিয়ে । পত্রপত্রিকার তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সালে গ্রামীণ টেলিকম নামে একটা কোম্পানির ১৭৬ জন কর্মকর্তা “শ্রমিক কর্মচারী কল্যাণ তহবিল” এর প্রাপ্য হিস্যা চেয়ে ১১০টি মামলা করেন। ইউনূস আইনজীবী নিয়োগ করে আদালতের বাইরে এসব অভিযোগ নিষ্পত্তি করেন। সেই নিষ্পত্তিতে তিনি কর্মচারীদের ৪৩৭ কোটি টাকা শোধ করেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ১০৬ টি মামলা প্রত্যাহার করেন। কিন্তু চাকরির শর্ত অনুযায়ী, কোম্পানি মুনাফার ৫ শতাংশ পাওয়ার দাবিতে শ্রম আদালত এবং হাইকোর্টে আবারও মামলা করেন তারা।

কিন্তু এই মামলা নিষ্পত্তির জন্যে ইউনূস আইনজীবীদের নিয়মের বাইরে প্রচুর টাকা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তে বের হয়ে আসে, গ্রামীণ টেলিকমের আইনজীবী ইউসুফ আলী ও জাফরুল হাসান

শরীফের তিনটি ব্যাংক হিসাব ও ইউসুফ আলীর ‘ল’ ফার্ম এটর্নিসের নামে ১৬ কোটি টাকা দেয়া হয়। দুদকের অনুসন্ধান কর্মকর্তারা গণমাধ্যকে জানান, ‘শ্রমিক কর্মচারী কল্যাণ তহবিল’ কর্মীদের পাওনা সংক্রান্ত অভিযোগ ধামাচাপা দিতে ড. ইউনূস বড় অংক দিয়ে আইনজীবী ভাড়া করেন। কথা ছিল এরা মামলাকারীদের সাথে আদালতের বাইরে পুরো বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন।

শুধু তাই নয় ‘শ্রমিক কর্মচারী কল্যাণ তহবিল’এর হাজার হাজার কোটি টাকা চুরির অভিযোগ ধামাচাপা দিতে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করেন ইউনূস। দুদকের অনুসন্ধানে এসব অভিযোগেরও সত্যতা মেলে। ২০২২ সালে তাদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করে দেয়া হয়। কর ফাঁকি মামলায় দোষী হন ইউনূস। দোষী সাব্যস্ত হবার পর দিনই উনি ১২ কোটি টাকা কর দেন। কর দিয়েই তিনি প্রমাণ করেন তিনি দোষী ছিলেন।

সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য উঠে আসে তার ট্রাস্ট গঠনের আড়ালে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ অনুসন্ধানে। দেখা যায় নিজের পরিবারের ব্যয়ের টাকাও এ ট্রাস্ট থেকেই নিতেন ইউনূস। এছাড়াও নিতেন উৎসব আপ্যায়ন খরচ এবং টেলিফোন বিল। কিন্তু আইন বলে, কোন কিছু ট্রাস্ট করলে সেখান থেকে খরচ নিতে পারবেন না দাতা। কিন্তু ট্রাস্ট না করে ওই একই কাজ যদি তিনি ব্যবসা হিসাবে করেন, তাহলে পারেন। কিন্তু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর আর ট্রাস্টের কর এক নয়। কেউ সমাজসেবা করলে, তার কাছ থেকে কম কর নিয়ে উৎসাহ দিতে পারে সরকার।

মোট তিনটি ট্রাস্ট গঠন করেন ইউনূস। একটি ট্রাস্টে এমন বিধান রাখেন, যেখান থেকে তিনি নিজে এবং তার পরিবারের সদস্যরা জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন। অথচ ট্রাস্ট গঠনের আইনে এরধনের কোন নিয়ম নেই। এছাড়াও ইউনূসের নামে শেল কোম্পানি গঠন করে এক কোম্পানির লাভ আরেক কোম্পানিতে দান করে কর ফাঁকি দেয়ার নজির পায় দুদক। শুধু গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের জমা ৫% লভ্যাংশের হিসাবে ৩৬০০ কোটি টাকা ইউনূস অন্য কোম্পানিতে দান হিসাবে সরিয়ে দেন।

এই প্রতিটি ঘটনায় বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করেছে। আপনারা আজীবন সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষায় কথা বলেছেন । তাই নিশ্চয়ই আপনাদের বোঝানোর দরকার নেই যে, বাংলাদেশের সাংবিধানিক কোন কাজ নিয়ে কথা বলতে হলে নিশ্চয়ই তথ্য প্রমাণ নিয়ে কথা বলতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনারা কোন দায়িত্বশীলতা দেখাচ্ছেন না।

আমরা জানি বেলারুশে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী এলেস বিয়ালিয়াটস্কির দশ বছরের জেল হয়েছে, আপনাদের কোন আওয়াজ পাওয়া যায়নি। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ফিলিপাইনের সাংবাদিক মারিয়া রেসা কর ফাঁকির মামলায় আদালতে ঘুরছেন। আপনাদের সেখানেও দেখা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশের সামনে নির্বাচন। এই সময় সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ নিয়েও আপনাদের উদ্বেগের শেষ নেই। নির্বাচনের আগে একটি দায়িত্বশীল সরকার আপনাদের এই দায়িত্বহীন কথার বলি হতে পারে, সে বিষয়টি কি আপনারা আমলে নেন না? এতে কী নির্বাচনী পরিবেশ সুষ্ঠু থাকছে? আমাদের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা নিয়ে দুর্নাম নেই। অথচ আপনাদের চিঠিতে এরকম একটি বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে বলছেন। কাজটি কী ঠিক করছেন?

আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ জানে না যে আপনার দেশে ডোনেশন বলে একটা কথা বলানোর বৈধ প্রথা আছে। রাজনীতিবিদ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চ্যারিটি সংগঠন থাকে। সেখানে সেবামূলক কাজের খরচ দিলে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে বিবৃতি পাওয়া সম্ভব। ক্রেস্ট কিম্বা সাটিফিকেটও পাওয়া সম্ভব। ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে দাওয়াতেও তারা আসতে পারেন। কিন্তু সেখানে কোন কিছুই ফ্রি করার প্রথা নেই। আনারা সেই প্রথার বাইরে শুধুই বন্ধুত্ব করছেন এরকম নিশ্চয়ই নয়? করুন, শুধু অনুরোধ জেনে বুঝে করুন।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

পাঠকের হৃদস্পন্দনে উচ্চারিত একটি শব্দ ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’

পাঁচ বছর পূর্ণ করে ৬ষ্ঠ বছরে পদার্পণ করলো আমাদের প্রিয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিন। শোষক সমাজের রক্তচক্ষু, পদে পদে বাঁধা ডিঙিয়ে প্রতিটি দিন পার করে চলেছি আমরা। তবে যতটা রক্তচক্ষুর ভয়, তার চেয়ে বেশি পেয়েছি পাঠকদের প্রাণভরা ভালোবাসা। পাঠকদের ভালোবাসায় মেহেরপুর প্রতিদিন এখন উচ্চারিত শব্দ। আমরা পাঠকদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। গেল পাঁচ বছরে মেহেরপুর

প্রতিদিন মানুষের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে। আমাদের প্রতিদিনের সংখ্যা, একেকটি জবাবদিহীতার অংশ হিসেবে কাজ করে। আমাদের জবাবদিহীতা সমাজের কাছে, সাধারণ জনগণের কাছে, পাঠকদের কাছে। প্রতিদিন ভোর হয় একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচনের লক্ষ্য নিয়ে। মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবার নতুন দিগন্ত উন্মোচনে বদ্ধ পরিকর।

সীমান্তবর্তী ছোট্ট জেলা মেহেরপুর থেকে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ অব্যাহত রাখা অনেক দুরহ একটি কাজ। যেখানে ছাপাখানা নেই, পত্রিকা মেকাপ করার জন্য মেকাপম্যান পাওয়া যায় না। প্রিন্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় ট্রেসিং পেপার ও কালিও পাওয়া যায় না। পত্রিকার রসদ যোগানো বিজ্ঞাপনদাতা বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানও নেই। কালেভদ্রে শুভেচ্ছা বিজ্ঞাপন পেতেও যে পরিমাণ বেগ পেতে হয়, তা আর নাই বললাম। সঙ্গে রয়েছে কাগজ, কালীসহ বিভিন্ন উপকরণের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি। অসংখ্য অসঙ্গতির মধ্যে দিয়ে একটি দৈনিকের পাঁচ বছর অতিক্রম করার ব্যাপারটি ছোট করে ভাবারও কিছু নেই। আমরা সেই ভাবনার কাজটি করে চলেছি।

সংগত কারণেই এ নিয়ে আমরা আনন্দিত, গর্বিত। আমরা পেরেছি। একটা জায়গায় মেহেরপুর প্রতিদিনকে দাড় করাতে পেরেছি। এই যাত্রায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অগণিত পাঠক আর শুভানুধ্যায়ী। মেহেরপুরসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষেরভালোবাসা আমাদের প্রধান শক্তি। পাঠকসাধারণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে পত্রিকাটি আমরা করোনার অতিমারিতেও প্রকাশ করে গেছি। আমরা বিশ্বাস করি, পাঠকই আমাদের সবচাইতে বড় শক্তি, বড় শ্রদ্ধার জায়গা। তাদের হাতে প্রতিদিন একটি গ্রহণযোগ্য পত্রিকা তুলে দেওয়ার চেষ্টা পাঁচ বছর ধরে আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছি। আগামী দিনেও এই নিষ্ঠা দৃঢ়ভাবে বজায় রাখব। মাঝে মধ্যে যে আমাদের ভুল হয়না এমনিটও নয়। ভুলত্রুটিগুলোর দায় নিয়ে সামনের দিনগুলোতে আরো ভালো করার চেষ্টা করবো।

‘জনগণের মুখপত্র’ এই স্লোগানের স্বাক্ষর রেখে যা কিছু জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে সেধরণের সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে আমাদের সহকর্মীরা নিরলস কাজ করছে। সংবাদের ভিতরকার সকল সত্য প্রকাশ কার চেষ্টা করেছি। অসততা আমাদের স্পর্শ করতে পারেনি। তবে আমরা নিরপেক্ষ নই। আমরা মানুষের পক্ষে। প্রতিটি সাধারণ মানুষ, প্রতিটি সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পক্ষে আমাদের কলম চলবে। দেশের মানুষই আমাদের মূলশক্তি।

২০১৮ সালের ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসের দিন যাত্রা শুরু

করেছিল মেহেরপুর প্রতিদিন। স্বাধীনতার এই মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসের যুদ্ধে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত ও দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতার দীপ্ত চেতনায় আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। অদম্য সাহস ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার অংশিদার আমরাও।

মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন একজন তরুন রাজনীতিবীদ এবং স্বপ্নচারী মানুষ। মেহেরপুর প্রতিদিনের মত আরো কয়েকটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। একজন গণমাধ্যমবান্ধব হিসেবে তিনি সমাজে সুপ্রতিষ্টিত এক চরিত্র। তাঁর সুদক্ষ দিকনির্দেশনায় আমরা মেহেরপুর প্রতিদিনকে নিয়ে গেছি এক অনন্য উচ্চতায়। যা এখন মেহেরপুরের প্রতিটি মানুষের উচ্চারিত একটি নাম। একটি শব্দ মেহেরপুর প্রতিদিন।

মেহেরপুর প্রতিদিন যা পারে, যা পেরেছে অন্য কেউ পারেনি, পারেনা। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এই আমাদের প্রতিজ্ঞা মেহেরপুর প্রতিদিন মানুষের মুখে মুখেই উচ্চারিত হতে থাকবে সবসময়। অর্ধযুগে পদার্পণের এই শুভক্ষণে সকল পাঠক, শুভান্যুধায়ী, বিজ্ঞাপনদাতা, কলাকুশলীর প্রতি শুভেচ্ছা।

বজ্রপাত থেকে ক্ষতি এড়াতে নির্দেশনা মেনে চলি

মেহেরপুরে গতকাল মঙ্গলবার বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে আবু বক্কর সিদ্দিক (৪৫) নামে এক কৃষক মারা গেছেন। আহত হয়েছেন দুই গৃহবধুসহ চার জন। নিহত আবু বক্কর সিদ্দিকের বাড়ি মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে। এছাড়া আহতরা হলেন, সদর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের আঙ্গুরা খাতুন (৩০) ও রাজাপুর গ্রামের কহিনুর বেগম (২৫), রাধাকান্তপুর গ্রামের কৃষক আহসান আলী (৪০) ও রহমতুল্লাহ ।
এছাড়া মেহেরপুর শহর সহ বেশ কিছু এলাকায় বজ্রপাতে গাছ পুড়েছে, বৈদ্যুতিক যন্ত্র বিকল হওয়ার মত ঘটনা ঘটেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

বর্ষা মৌসুমে সবচেয়ে ভীতিকর বিষয় হচ্ছে বজ্রপাত। সাধারণত এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। এই সময়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতর বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছে। যে সাবধানতাগুলো মেনে চললে বজ্রপাতে হতাহতের ঝুঁকি হৃাস পাবে।

সাবধনাতা মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায় ডা, জমির মো: হাসিবুস সাত্তার ফায়ার সার্ভিসের নির্দেশনাগুলো তার ফেসবুকে জনসাধারণ জন্য তুলে ধরেছেন। সময়োপযোগী এ বিষয়টি সবার সামেন তুলে ধরার জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

তার পোস্ট থেকে নেওয়া নির্দেশনাগুলো হলো- ১।বজ্রপাতের ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করবেন না। ২. প্রতিটি বিল্ডিংয়ে বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন নিশ্চিত করুন। ৩. খোলাস্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে দূরে সরে যান। ৪. কোনো বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে যান। ৫. খোলা জায়গায় কোনো বড় গাছের নিচে আশ্রয় নেয়া যাবে না। গাছ থেকে চার মিটার দূরে থাকতে হবে। ৬. ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তার থেকে দূরে থাকতে হবে। বৈদ্যুতিক তারের নিচ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে। ৭. ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্লাগগুলো লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে।৮. বজ্র পাতে আহতদের বৈদ্যুতিক শকে আহতদের মতো করেই চিকিৎসা দিতে হবে। ৯. এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রপাত বেশি হয়। এই সময়ে আকাশে মেঘ দেখা গেলে ঘরে অবস্থান করুন। ১০. যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন। ১১. বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি বা বারান্দায় থাকবেন না এবং ঘরের ভেতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকুন।
১২. ঘন-কালো মেঘ দেখা গেলে অতি জরুরি প্রয়োজনে রাবারের জুতা পরে বাইরে বের হতে পারেন। ১৩. উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি, তার, ধাতব খুঁটি ও মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন। ১৪. বজ্রপাতের সময় জরুরি প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করুন। ১৫. বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, মাঠ বা উঁচু স্থানে থাকবেন না। ১৬. কালো মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা, জলাশয় থেকে দূরে থাকুন। ১৭. বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখুন এবং নিজেরাও বিরত থাকুন। ১৮. বজ্রপাতের সময় খোলা মাঠে থাকলে পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙুল

দিয়ে মাথা নিচু করে বসে পড়ুন। ১৯. বজ্রপাতের সময় গাড়ির মধ্যে অবস্থান করলে, গাড়ির থাতব অংশের সঙ্গে শরীরের সংযোগ ঘটাবেন না। সম্ভব হলে গাড়িটিকে নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন। ২০. বজ্রপাতের সময় মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করুন।

তাই আসুন, সাবধানতা অবলম্বন করি, অন্যকেও এই বিষয়গুলো জানানোর মধ্যে দিয়ে বজ্রপাতে ঝুকি হৃাসে এগিয়ে আসি।

দ্রুত প্যানেল চেয়ারম্যান গঠন হোক

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৬১ নং আইনের (১) উপধারায় বলা আছে পরিষদ গঠিত হওয়ার পর প্রথম অনুষ্ঠিত সভার ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে অগ্রাধিকারক্রমে তিন সদস্যের চেয়ারম্যান প্যানেল, সদস্যগণ তাদের মধ্যে থেকে নির্বাচন করবেন। তবে তিন সদস্যের গঠিত চেয়ারম্যান প্যানেলের মধ্যে একজন সংরক্ষিত নারী সদস্য থাকতে হবে।

কিন্তু মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া, সাহারবাটি ও কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা এই আইনের তোয়াক্কা না করে প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচন করেননি। মেহেরপুর প্রতিদিন এ গতকাল রবিবার বিষয়টিতে গুরত্ব দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে। প্রকাশিত সংবাদে জানা গেছে, পরিষদের প্রথম সভার ৬ মাস পেরিয়ে গেলেও ওই তিন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন। তবে ইউপি সদস্যদের অভিযোগ, প্যানেল চেয়ারম্যান গঠন হলে চেয়ারম্যানদের সুযোগ সুবিধা কমে যেতে পারে এই আশঙ্কায় তারা নাকী প্যানেল চেয়ারম্যান গঠন করেননি।

কিন্তু আইনে বলা আছে, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালন করতে না পারলে বা অনুপস্থিত থাকলে চেয়ারম্যানের প্যানেল থেকে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে একজন সদস্য চেয়ারম্যানের সব দায়িত্ব পালন করবেন। পদত্যাগ, অপসারণ বা মৃত্যুজনিত কারণে

চেয়ারম্যান পদ শূন্য হলে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান প্যানেলের কোনো সদস্য চেয়ারম্যানের সব দায়িত্ব পালন করবেন।

চেয়ারম্যানরা ইউনিয়ন পরিষদসহ বিভিন্ন কাজে মাঝে মধ্যেই জেলার বাইরে যান। তাহলে ওই সময় ইউনিয়ন পরিষদে নাগরিক সেবা কারা দিয়ে থাকেন? নাকী প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচন না হওয়ায় ওই তিন ইউনিয়নের নাগরিকরা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

বিষয়টি নিয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম বলেছেন, এসব চেয়ারম্যানদের প্যানেল চেয়ারম্যান গঠণের জন্য আনুমানিক ২ মাস আগে চিঠি দেওয়া হয়। চেয়ারম্যান প্যানেল গঠন করে তাদের রেজুলেশন কপি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া ছিল। কিন্তু গত শনিবার ১৮ জুন পর্যন্ত সেটা দেইনি তারা। এর পরেও তারা গতকাল পর্যন্ত প্যানেল চেয়ারম্যান গঠনের কোন রেজুলেশন দিয়েছেন কীনা তা মেহেরপুর প্রতিদিনকেও নিশ্চিত করা হয়নি।

এমতাবস্থায়, জনগণের কাঙ্খিত সেবা যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে স্থানীয় সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকেই দেখতে হবে। আশা করবো দ্রুত সময়ের মধ্যে ওই ইউনিয়ন গুলোতে প্যানেল চেয়ারম্যান গঠনের জন্য সংশ্লিষ্টরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বন্যার্তদের সহযোগীতায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে

ভারতের মেঘালয় ও আসামে ক্রমাগত বৃষ্টির কারণে বাংলাদেশে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়ে ইতোমধ্যে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, রংপুর ও কড়িগ্রাম জেলা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৩৫ লাখ মানুষ বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে বলে ধারণা সংশ্লিষ্টদের।

সিলেটের সাথে সারাদেশে সকল ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ রয়েছে। আকাশপথ, রেলপথ, সবশেষে সড়ক পথের যোগাযোগও। নিরাপত্তাজনিত কারণে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাও বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। মোবাইল নেটওয়ার্কও

বন্ধের পথে। সিলেট বিভাগের ৮০ ভাগ এখন পানির নিচে। এক করুণ অবস্থায় সিলেট বিভাগের মানুষ।

সিলেট, সুনামগঞ্জসহ কয়েকটি এলাকায় বন্যার কারণে সারা দেশে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা আগামী ২৫ জুন পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

উজান থেকে নেমে আসা পানিতে চলতি মৌসুমের তৃতীয় দফা বন্যা দেখা দিয়েছে সিলেট অঞ্চলে। এর আগে গত এপ্রিলে সিলেটের নিম্নাঞ্চলে অসময়ে বন্যা দেখা দেয়। এরপর মে মাসের মাঝামাঝিতে সিলেটে ১৮ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা হয়।

প্রতিবছরই বন্যা আসে প্রাকৃতিক নিয়মে। কিন্তু দেশের নদ-নদীগুলোর এখন যে অবস্থা, তাতে অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত হয়ে সাগরে যেতে পারছে না। বেশির ভাগ নদী ভরাট হয়ে গেছে। গভীরতা হ্রাস পাওয়ায় পানি ধরে রাখার ক্ষমতা হারিয়েছে অনেক নদী। সে কারণে যতই দিন যাচ্ছে বন্যার স্থায়িত্ব ও ভয়াবহতা বাড়ছে।

সরকারি, বেসরকারি, এনজিও, বিভিন্ন সংগঠন বন্যার্তদের সহযোগীতায় যে যার মত এগিয়ে এসেছে। স্মরণকালের ভয়াবহ এ বন্যা মোকাবেলায় এসকল ত্রাণ সামগ্রী খুবই অপ্রতুল। বন্যা নিয়ন্ত্রণে এখনই স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে আপাতত দাঁড়াতে হবে বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে। পর্যাপ্ত ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের সব প্রান্ত থেকে যার যার সাধ্যমত বন্যার্তদের পাশে দাড়াতে হবে। বন্যাকবলিত এলাকায় পানিবাহিত রোগ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধসহ মেডিক্যাল টিম পাঠাতে হবে।

মুুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই থেকে জামুকার তালিকা বহির্ভূত

আবেদনকারীদের বাতিল করা হোক

জীবন বাজি রেখে যে সকল বীর সন্তানরা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, যাদের আত্মত্যাগের কারণে আমরা একটি স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি। বিশ্বে বাংলাদেশ নামের একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। তারাই জাতির শেষ্ঠ্র সন্তান।

মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কথা বলে যতটুকু জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধে যারা অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, তারা কখনোই সনদ কিংবা সরকারি কোন সুবিধা পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন না। দেশে পরাধীনতার শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করতেই তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়ে যখন দেশদ্রেীহী, রাজাকার, রাজাকারের সন্তানরা মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার জন্য আবেদন করেন তখন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা তা মেনে নিতে পারেন না। তা নিরসন করার জন্য যখন তারা দাবি তোলে, তাদের সেই আর্তনাদ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনও মাথাব্যাথা দেখা যায় না।

গতকাল বুধবার মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে ‘মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাইয়ে তালিকা বহির্ভূতদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রতিবাদে মুক্তিযোদ্ধারা স্মারকলিপি প্রদান’ করেছেন জেলা প্রশাসকের কাছে। মেহেরপুর সদর উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাইকে কেন্দ্র করে এঘটনা ঘটেছে।

স্মারকলিপিতে মুক্তিযোদ্ধারা অভিযোগ করে বলেছেন, জামুকা কর্তৃক প্রদত্ত অন-লাইনে আবেদনকারীদের তালিকাভুক্ত মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৪৮৯ জনের যাচাই-বাছাই এর কাজ ইতোমধ্যে তথাকথিত বিতর্কিত কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়নি। জামুকা কর্তৃক প্রদত্ত জিডি নম্বরসহ তালিকা বহির্ভূত কয়েকজন ব্যক্তিকে এমনকি রাজাকারের সন্তানসহ তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা বানানোর জন্য জামুকা কর্তৃক ২০১৭ সালের বিধি-বিধান/নিয়মনীতি উপেক্ষা করে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এমনকি সাক্ষাৎকারকারীগণ অরিজিনাল সনদ না দেখিয়ে নকল ফটোকপি প্রদর্শন করেছেন। আমরা এর নিন্দা জ্ঞাপন করছি এবং তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে জামুকা কর্তৃক প্রদত্ত জিডি নম্বর সহ তালিকা বহির্ভূত ব্যক্তিদের কে মুক্তিযোদ্ধা বানানোর অপচেষ্টা বন্ধ

করার জোর দাবি জানাচ্ছি।

স্মারকলিপির প্রথমেই তারা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটিকে বিতর্কিত বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ কমিটি বাতিলের দাবিতেও ইতোপূর্বে সংবাদ সম্মেলন, মানববন্ধনও করেছেন মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযোদ্ধাদের দাবি অনুয়ায়ি জেলা প্রশাসন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। যা অত্যন্ত দু:খজনক। তখন ব্যবস্থা নেওয়া হলে হয়তো নতুন করে তালিকা বহির্ভূতদের সাক্ষাতের বিষয়ে স্মারকলিপি দিতে হতো না।

স্মারকলিপিতে তারা আরও দাবি করেছেন, রাজাকারের সন্তানও নাকি মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার জন্য যাচাই বাছাই কমিটির কাছে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। যে আবেদন তারা করেছেন তা জামুকার পরিপত্র অনুসারে নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে। নির্ধারিত সময়ের পরে নতুন করে আবেদন করার কী বিধান আছে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলতে পারবেন? তবে বিষয়টি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কারণে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছি, স্বাধীন দেশে বুকভরে নি:শ্বাস নিতে পারছি, আসুন তাদের কথাগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করি। অমুক্তিযোদ্ধা, ভুয়া, রাজাকার, রাজাকারের সন্তান যারা আবেদন করেছেন মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার জন্য (মুক্তিযোদ্ধারা তাদের দাবিতে যেভাবে বলেছেন)। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দাবি আমলে নিয়ে ওই সকল আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

পরিশেষে, বর্তমান সরকার জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা, ভাতা বৃদ্ধি, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ঘর নির্মাণ সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা চালু করেছেন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জমি আছে ঘর নেই এমন অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রায় সাড়ে ১৩ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়ে বীর নিবাস নামের বাড়ি নির্মাণ করে দিচ্ছেন। যার কাজ চলমান রয়েছে।

যদি আজ ভুয়া, অমুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযোদ্ধা বনে যান, সরকারের এসকল সফল উদ্যোগ, ওই সকল লোভাতুর মানুষদেরকেই কেবল সুবিধা

দেবে। বঞ্চিত হবে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা।

রাজনৈতিক চর্চার মাধ্যমে গণতন্ত্র বিকশিত হোক

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা করতে হলে সময়মতো সম্মেলনের কোন বিকল্প নেই। একই কমিটি দীর্ঘদিন ধরে থাকলে সেই কমিটির নেতৃত্ব বজায় থাকে না। দলীয় নেতা কর্মীদের উদ্যোম নষ্ট হয়। তেমনই হয়েছে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ কমিটির। দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে ওই ইউনিটের সম্মেলন না হওয়ায় পৌর কমিটির নেতাকর্মীদের মধ্যে স্থবিরতা লক্ষ্য করা গেছে। কমিটির অনেক সদস্য মৃতবরণও করেছেন।

নতুনরা কমিটিতে আসবেন সে সুযোগও তৈরি হয়নি। একই অবস্থা বিরাজ করছে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের কমিটিতে। ওই কমিটিরও সম্মেলন হয়নি দীর্ঘদিন। এছাড়া মুজিবনগর উপজেলা কমিটি, গাংনী পৌর কমিটি ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের কমিটির মেয়াদও শেষ হয়েছে অনেক আগে।

এর আগে কয়েকবার এসব কমিটির সম্মেলন হওয়ার কথা থাকলেও অজানা কারণে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। এক নেতা আরেক নেতার উপর দায় চাপিয়ে গেছেন এমন অভিযোগও রয়েছে বিস্তর। একটি পক্ষ সম্মেলন চাইলেও অপরপক্ষ সম্মেলন বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন এমন অভিযোগ রয়েছে দলের মধ্যে। সর্বশেষ মাস দুয়েক আগেও সম্মেলনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেও সম্মেলন পিছিয়ে যায়।

অবশেষে গত সোমবার জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় নতুন করে চারটি ইউনিটের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এগুলোর মধ্যে ১৯ মার্চ মেহেরপুর পৌর শাখা, ২০ মার্চ সদর উপজেলা শাখা, ২১ মার্চ গাংনী উপজেলা শাখা এবং ২২ মার্চ মুজিবনগর উপজেলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

নতুন করে এই ইউনিটগুলোর সম্মেলনের দিন ঘোষণা হওয়ায় নেতাকর্মীদের মধ্যে আবারও চাঞ্চল্যতা শুরু হয়েছে। কমিটিতে ঠাঁয় পাবার জন্য বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা তদবির করছেন এমন খবর পাওয়া

যাচ্ছে। নতুনভাবে প্রতিটি ইউনিটে কর্মীদের মধ্যে রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। সুষ্ঠ রাজনৈতিক চর্চার মাধ্যমেই গণতন্ত্র বিকাশের একমাত্র পথ। সম্মেলন এবং কমিটি গঠনের ধারাটিও যাতে সুষ্ঠ রাজনৈতিক চর্চার মধ্যে দিয়ে হয়, সচেতন মানুষ এবং রাজনৈতিক কর্মীরা এটাই চায়।

তাই পূর্বের মত যেন আবারও সম্মেলন পিছিয়ে না যায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দদের কাছে সকল সচেতন নাগরিক ও রাজনীতিপ্রেমী মানুষের প্রত্যাশা। দীর্ঘদিন পরে হলেও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের এ উদ্যোগ সফল হোক, সফল হোক ৪টি ইউনিটের সম্মেলন। নতুন নেতৃত্বে বিকশিত হয়ে রাজনৈতিক চর্চার মাধ্যমে দলীয় কর্মকাণ্ড গতিশীল হোক।

নির্বাচনী সহিংসতা রুখতে প্রশাসনিক নজরদারি বাড়াতে হবে

২য় ধাপে মেহেরপুরের ৯টি ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো গেল ১১ নভেম্বর। নির্বাচনের আগে ও পরে কয়েকটি ইউনিয়নে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। সহিংসতায় গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের লক্ষিনারায়ণপুর ধলা গ্রামে ২জনের প্রাণহানিসহ আহত হয়েছে অন্তত ২০ জন।

এসকল সহিংসতায় ব্যবহার করা হয়েছে দেশীয় অস্ত্র। তার মধ্যে রয়েছে হাসুয়া, লাঠি, বল্লম, রামদা, মাথাল, গিয়ার,টেটাসহ কয়েক প্রকারের অস্ত্র।

মেহেরপুরে নির্বাচনের দিন পুলিশ প্রশাসনের যে তৎপরতা লক্ষ্যে করা গেছে একই তৎপরতা তফসিল ঘোষনার পর থেকে শুরু হলে সহিংসতা এড়ানো যেত। নির্বাচন পূর্ব সময়ে বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র উদ্ধারে পুলিশের অভিযানও দেখা যায়নি। তবে নির্বাচন পূববর্তী সময়ে র্যাবের অভিযানে দুজন আটক হয়েছে দুটি অস্ত্র সহ।

গত ৩ নভেম্বর কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়িয়াতে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নির্বাচনী কর্মীসভায় গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক প্রধান অতিথি হিসেবে

যোগ দেন। ওই মঞ্চে প্রধান অতিথির সফরসঙ্গী হয়ে শর্টগান নিয়ে মঞ্চে প্রদর্শণ করেন হাবিবুর রহমান নামের এক ব্যক্তি। বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় শুরু হলে পরদিন গাংনী থানা অস্ত্রটি জমা নেয়।

৮ নভেম্বর কাথুলী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড লক্ষিনারায়ণপুর ধলা গ্রামে ইউপি সদস্য প্রার্থী আজমাইন হোসেন ভোট চাইতে গেলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আতিয়ার রহমানের কর্মী তার উপর হামলা চালায়। এসময় সে গুরতর আহত হয়। তার চিৎকারে মামাত দুই ভাই জাহাদুল ইসলাম ও সাহাদুল ইসলাম বাঁচাতে গেলে তাদেরকে দেশী অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করা হয়। পরে পুলিশ ও র্যাবের পৃথক দুটি টিম আতিয়ারের ভাইয়ের বাড়ি থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহার করা কয়েক প্রকার দেশী অস্ত্র উদ্ধার করে। এ দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইউপি নির্বাচনে সহিংসতার আশঙ্কা তৈরি হয়।

নির্বাচনের দিন দুটি সেন্টারে প্রার্থীদের কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিলে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ফাঁকা গুলি ছুড়েছে। এছাড়া তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি।

অস্ত্র উদ্ধারে যেমন পুলিশের তেমন কোন তৎপরতা দেখা যায়নি। অপরদিকে জেলা প্রশাসনও বৈধ অস্ত্র জমা দেওয়ার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের অফিসার ইনচার্জ জুলফিকার আলী বলেন, নির্বাচনী পূর্ববর্তী এক মাস আগে জেলা পুলিশের কোন অস্ত্র উদ্ধার নেই। পুলিশ সুপারের নির্দেশ ছিলো নির্বাচনি সহিংসতা এড়াতে সকল ধরণের অভিযান পরিচালনা করতে এবং বিশেষভাবে নজরদারি করতে।

সুজনের (সুশাসনের জন্য নাগরিক) মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন বলেছেন, নিবাচনে সহিংসতা মোটেও কাম্য নয়। কাথুলীতে সহিংসতার কারণে যে দুটি প্রাণহাণি হয়েছে অত্যন্ত দু:খজনক। এ ব্যাপারে প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন ছিল। অস্ত্র প্রদর্শণের কথা শুনেছি সেখানেও আরো একটু নজরদারির দরকার ছিল।
মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম বলেছেন, নির্বাচন পূর্ববর্তী এক মাসের মেহেরপুরে কোন অস্ত্র উদ্ধার নেই এটা ঠিক। তবে পুলিশ বিভাগের তৎপরতা অব্যাহত ছিলো নির্বাচন কেন্দ্রিক সহিংসতা যাতে না হয়। কাথুলীর সহিংসতা দীর্ঘদিনের একটি দ্বন্দ্বের

জেরে ঘটেছে। নির্বাচনের প্রচারণাকে বিরোধী পক্ষ সুযোগ নিয়ে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে। এরপর আমরা অনেকগুলো দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছি।

তিনি আরো বলেছেন, কাথুলীর গাড়াবাড়িয়াতে যে ব্যক্তি অস্ত্র প্রদর্শণ করেছিলেন আমরা জানার পর সেটি থানা হেফাজতে নিয়েছে। তার লাইসেন্সের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করা হচ্ছে। তবে এ ধাপের নির্বাচন সহিংসতার বিষয়টি নিয়ে সামনে নিয়ে ২৮ নভেম্বরের নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে পুলিশে আরো সজাগ হবে।

সহিংসতা, প্রাণহানির মধ্যে আতঙ্ক ছাপিয়ে দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়াই মেহেরপুরের ৯টি ইউপিতে নির্বাচন সুষ্ঠ হয়েছে। এমন নির্বাচন করতে সহায়তা করায় প্রশাসনকে সাধুবাদও জানিয়েছেন ভোটাররা। আমরা প্রত্যাশা করবো আগামি সকল নির্বাচন সুষ্ঠ হোক, সহিংস মুক্ত হোক। গণতন্ত্রের এ ধারা অব্যাহত থাকুক।